

DECLARATION

I, Sushmita Nath bearing Registration Number Ph.D/1262/2010 dated 04.10.2010 hereby declare that the subject matter of the thesis entitled “ASHALATA SINGHER CHOTOGOLPA : NARI PARISAR SANDHAN” is the record of work done by me and that the contents of this thesis didnot form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other University / Institute.

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali

Date :

Place : SILCHAR

(Sushmita Nath)

Deptt. of Bengali

Assam University, Silchar

কথামুখ

সেকালের বাঙালি মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা, তাঁদের অবস্থান, তাঁদের চিন্তাভাবনা প্রভৃতি নিয়ে জানার ইচ্ছে আমার অনেকদিন থেকেই। বিশেষ করে যখন জানতে পারলাম সেকালের সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থান নির্ধারিত ছিল অন্তঃপুরের চারদেওয়ালের মধ্যে, মুক্ত আকাশের নিচে যাদের বেরোনোর সাধ্য ছিল না, এমনকি, যারা শিক্ষার অধিকার থেকেও ছিল বঞ্চিত। আর এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখিকারা কিভাবে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আপন পরিচয়ে পরিচিত হয়ে উঠলেন, তাই জানার আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমার পড়াশোনার সূত্রপাত। রাসসুন্দরী দাসী, শৈলবালা ঘোষজায়া, আশাপূর্ণা দেবীর মতো লেখিকাদের জীবনী তথা লেখনী সম্বন্ধে পড়তে শুরু করলাম তখন আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি বাংলাসাহিত্যের এমন একজন লেখিকার প্রতি, যিনি সময় ও সমাজ থেকে ছিলেন অনেকটাই প্রাগ্রসর। তাঁর নাম হলো আশালতা সিংহ। ১৯১১ সালের ১৫ জুলাই ভাগলপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী তথা শিল্প-সাহিত্যনুরাগী পিতা যতীন্দ্রমোহন সরকারের সান্নিধ্যে ও সহযোগিতায় ক্রমশ বিকশিত হয় তাঁর শিল্পিসত্তা। এছাড়াও জীবনপথে শিল্প-সাহিত্যজগতের সঙ্গে জড়িত এমন-এমন কিছু ব্যক্তিদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি যা তাঁকে সাহিত্যে মনোনিবেশ করার রসদ যুগিয়েছে। আশালতা সিংহ লিখেছেন উনিশটি উপন্যাস, চারটি গল্পসংকলন, দু'টি নাটক এবং বেশকিছু প্রবন্ধ। এই নারী ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার আকর্ষণের অন্যতম কারণ তাঁর ব্যতিক্রমী জীবন এবং লিখনশৈলী। পরবর্তীতে এই আকর্ষণ থেকেই তাঁকে আরও গভীরভাবে জানার চাহিদায় গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছি। আমার গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়— “আশালতা সিংহের ছোটগল্প : নারীপরিসর সন্ধান”। এই

গবেষণা সন্দর্ভকে ভূমিকা, উপসংহার ছাড়া মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা ড० দূর্বা দেব। তাঁর স্নেহ, উৎসাহ, শাসন ও উদার আনুকূল্য ছাড়া আমার গবেষণার কাজ কখনো সম্ভব হত না। আমি সানন্দে ও অকপটচিত্তে তাঁকে প্রণাম জানাই। তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও পথপ্রদর্শক।

অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড० রমা ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক তথা আমার শিক্ষক বিশ্বতোষ চৌধুরীকে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁরা নানাভাবে আমার গবেষণা কর্মের পরিণতিদানে প্রয়োজনীয় বইপত্র ও উপদেশ দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কর্মীগণকে। যাঁরা আমার গবেষণাকর্মে প্রভূত সহায়তা করেছেন, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষকে। যিনি আশালতা সিংহ সম্বন্ধে আমার নানা জিজ্ঞাসু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করেছেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিকাশ রায় মহাশয়কে। যার অকুণ্ঠ সাহায্য-সহযোগিতা, উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় আমার গবেষণা কর্মটি অগ্রসর হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাই কলকাতার লিটিল ম্যাগাজিনের সন্দীপ দত্তকে। তিনি আমার গবেষণাকর্মে প্রয়োজনীয় পত্র-পত্রিকা দিয়ে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (কলকাতা), ন্যাশনাল লাইব্রেরি (কলকাতা) এবং শিলচরের দ্বিজেন্দ্র-ডলি মেমোরিয়াল লাইব্রেরিকে। এই লাইব্রেরিগুলোর সহযোগিতা ছাড়া আমার গবেষণাকর্মের সম্পূর্ণতা সম্ভব হত না। এছাড়াও যাঁদের নিরন্তর তাগদা ও সহযোগিতায় আমার গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে তাঁরা হলেন আমার পূজনীয় পিতা-মাতা। তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী। চেষ্টা করেছি আমার গবেষণায় প্রাসঙ্গিক

তথ্যগুলোকে যথাযথ ব্যবহার করার জন্য। প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো আমার নজর এড়িয়ে রয়েই গেল কিছু তথ্য ও ছাপার ভুল। এই অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত।

সুমিত্রা নাথ

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
প্রথম অধ্যায় : লেখিকা সত্তার হওয়া আর হয়ে ওঠা	৩৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : আশালতার গল্পবিশ্বে : বিষয় বৈচিত্র্য	৬১
তৃতীয় অধ্যায় : লেখিকার কলমে পুরুষতন্ত্রের প্রতিবাদ	১১৪
চতুর্থ অধ্যায় : আশালতা সিংহের গল্পবিশ্বে : নারী প্রাধান্যের জগৎ	১৫০
পঞ্চম অধ্যায় : দ্বৈতসত্তার সম্মিলন : লেখিকা আশালতা বনাম সন্ন্যাসিনী আশাপুরী	১৮২
ষষ্ঠ অধ্যায় : নারীর লেখায় নারীর ভাষা	২০৫
উপসংহার : নারীর কথা খোঁজার অন্বেষণ	২৫০
গ্রন্থপঞ্জী :	২৫৫
পরিশিষ্ট :	২৭২



ভূমিকা

নারীপরিসর :

পরমেশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানবজাতি। আর এই মানবজাতি নর ও নারী এই দুভাগে বিন্যস্ত। প্রাচীনকাল থেকেই নারীর নিয়ন্ত্রক নর অর্থাৎ পুরুষ। পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থায় নারীদের সকল ক্ষেত্রেই ছিল অধিকারহীনতা। শাস্ত্রকার মনুও নারীদের স্বাধীনভাবে বাঁচার যোগ্য বলে মনে করেননি। তিনি বলেছিলেন—

“পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি।”

ব্রাহ্মণ্যযুগেও দেখা যায়, যে নারীরা পুরুষের আনুগত্য গ্রহণ করে সেই নারীরাই পুরুষের শ্রদ্ধার অধিকারিণী। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—

“তদৈ সমৃদ্ধঃ যস্য কণীয়াংসো ভার্য্যা আসন
ভূয়াংস পশবঃ” “মানে তাকেই বলা যায় সমৃদ্ধ
ব্যক্তি যার ভার্য্যা সংখ্যা কম কিন্তু পশুর সংখ্যা
বেশী।”^২

কারণ সে সময় ব্যক্তির ভাবতেন পশুদেরকে কম খরচে রক্ষণাবেক্ষণ করা যাবে আর তার কাছ থেকে প্রাপ্তি ঘটবে দুধ, মাংস। এই দুধ বিক্রি করে যেখানে উপার্জন হয়, সেখানে ভার্য্যাকে কিন্ত দিতে হয় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। এমন কি বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে বা পাশ্চাত্য বিভিন্ন কবিদের লেখনীতেও দেখা যায় নারী অবহেলিত, লাঞ্ছিত।

উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য নারীকে নিজের দেহের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

মৈত্রায়ণী সংহিতায় বলা হয়েছে, “নারী অশুভ”^৩ তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও একই কথা রয়েছে।

স্কটল্যান্ডের জননরু তাঁর ‘ইংলিশ উইমেন লাইফ এ্যাণ্ড লেটাস’ গ্রন্থে বলেন— “মেয়েরা দুর্বল, বোকা নিষ্ঠুর। মেয়েদের চেতনাবুদ্ধি চেপ্টা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাতে ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করা হয়।” এছাড়া দেখা যায়,

“নারী মিথ্যাচারী, দুর্ভাগ্যস্বরূপিণী, সুরা বা
দৃত্যক্রীড়ার মত একটি ব্যসনমাত্র।”^৪

বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে উন্নত দেশ চীনেও নারীদের নিয়ে প্রচলিত বাক্য ছিল,

“জ্ঞান যেমন পুরুষের শোভা বৃদ্ধি করে, অজ্ঞান
তেমনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।”^৫

“৫৮৫ খ্রিঃ Mecon নগরে খ্রিস্টীয়
ধর্মযাজকগণের আলোচনার বিষয় ছিল নারীরা
মানবীয় জীব না অন্য কিছু।”^৬

আর জগৎ বিখ্যাত সেন্ট পল শিখিয়েছেন,

“ধর্ম সম্বন্ধে নারী পুরুষের মত কোন প্রশ্ন
করিতে পারিবে না। সে সর্বদাই তাহার স্বামীর
অধীন।”^৭

এমনকি এও বলেছেন,

“কোনো শিক্ষা পাবার, ধন অর্জন বা স্বাধীনভাবে ভোগ করবার, এমন কি নিজের দেহটিকেও অবাঞ্ছিত সম্ভোগ থেকে রক্ষা করবারও অধিকার তার নেই।”^৮

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পৃথিবীর সর্বত্রই নারী অবহেলিত, লাঞ্ছিত হয়েছে। সভ্যতার উষালগ্নে মানবজাতি সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক কর্তৃক পরিচালিত হতেন। এমনকি, অনেকে নিজের পরিচয় দিতেন মায়ের নাম দিয়ে। **Dr. Bechofen's theory** তে লেখা আছে—

“It is quite true that in a very considerable number of tribes we find the habit of giving the mother's name to the child, and tracing through her whatever, inheritance there be of rank of property.”^৯

পরবর্তীকালে tribes-এর মধ্যেও এই ধারণাটি প্রযোজ্য হতে দেখা যায়। উরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জনজীবনের দিকে লক্ষ্য করলে জানা যায় যে তাদের স্ত্রীরা অন্দর-বাহির উভয় জগতের সংগে পরিচিত ছিলেন। আমরা জানি, “ব্রহ্মদেশকে মেয়ে রাজার দেশ এখনও লোকে বলে।” কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে একসময় নারী তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে, অন্তঃপুরের গঞ্জীর মধ্যে তার জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। মূলতঃ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনে বৈদিক আর্ষদের গোষ্ঠী ও কৌমণ্ডলির মধ্যে ঋগ্বেদের পরবর্তী স্তরে ভাঙন দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও ধনপতি করে তোলার চাহিদার উন্মেষ ঘটতে থাকে। মানুষের চিন্তাভাবনায় নানা জটিলতা ঘর বাঁধতে শুরু

করে। ফলস্বরূপ বহির্জগত প্রসারিত জীবনধারণ থেকে সরে অন্তঃপুরের নিয়মনীতির নাগপাশে নারী বন্দী হয়ে যায়। এছাড়া নারীর সামাজিক, আর্থিক অবলুপ্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল বৈদেশিক আক্রমণ। ইতিহাসে প্রোড্জুল উদাহরণ আছে, নৃশংস মুসলমান শাসকরা অর্থভাণ্ডার পরিপূর্ণ বা সাম্রাজ্য প্রসারিত করার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষের বৃকে পর্দাপণ করেন। তখন নিরাপত্তা প্রদানের জন্য নারীকে ‘অন্তঃপুরে’ প্রবিষ্ট হতে হয়। আর এই নিরাপত্তা দেওয়ার প্রচেষ্টাই শেষপর্যন্ত নারীর সমস্ত অধিকার বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষের মাটিতে বিভিন্ন সময় ভিন্ন-ভিন্ন বৈদেশিক শক্তির তাদের সাম্রাজ্য প্রসারিত করার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আসেন, কিন্তু একমাত্র ইংরেজ শাসকদের চিন্তাভাবনায় নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সাড়ে পাঁচশো বছরের মুসলমান রাজত্বে আমরা যেখানে দেখি, ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় ভাবধারা অটুট ছিল সেখানে ইংরেজ আগমনে এলো বৈপ্লবিক রূপান্তর। বঙ্গদেশের জনসাধারণের জীবনধারণ পদ্ধতি, চিন্তাধারায় আধুনিক ভাবধারার উন্মেষ ঘটল। সেই পটভূমিতে মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণীর মানুষদের চিন্তাধারায় এল অসাধারণ রূপান্তর। সে সময় নারীজাতির অবস্থা ছিল শোচনীয়। স্ত্রীজাতির প্রতি সমাজের মনোভাব কি ছিল সে সম্পর্কে রাজারামমোহন রায় সতীদাহ বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থে বলেন—

“একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসজ্জিদী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হয় না।”

১০

Sir A.E. Wright নামে একজন শল্য চিকিৎসক ‘The Times’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে (১৯১২ সালের ২৮ মার্চ) লেখেন—

“মেয়েদের মানসিক ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে কম এবং
তাঁদের মানসচিত্র বিকৃত”^{১১}

ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে ইংলণ্ডের মতো উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশেও মেয়েদের নিয়ে এ ধরনের ভাবনা ছিল। যদিও ইংলণ্ডে মেয়েদের জীবন অন্তঃপুরের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষার জগতে স্বচ্ছন্দ গতিতে তাঁদের বিচরণ করার অধিকার ছিল। সে সময়ে নব্যশিক্ষিত, কল্যাণকামী ব্যক্তিবর্গ ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের অবহেলিত মহিলাদের বৈষম্য লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন যে তাদেরকে উন্নত না করলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে সহধর্মিনীদের শিক্ষিত হিসেবে দেখতেও তারা আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁদের উন্নতির জন্য নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সচেতন হয়ে ওঠলেন। কুসংস্কারের বীভৎস চিত্র অবলোকন করে রামমোহন নারীর উপর ঘটে চলা অত্যাচার ও প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। অন্যদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য ছিল—

“স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন
যে, তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? আপনারা
বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই,
তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কীরূপে নিশ্চয়
করেন?”^{১২}

এছাড়া তিনি পুরুষশাসিত হিন্দুসমাজ সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেন—

“এই সমাজ স্বার্থপর ও ভণ্ড। সে কারণেই এ সমাজ
মহিলাদের ‘প্রকৃতি প্রদত্ত’ প্রশংসনীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি
অস্বীকার করেছে।”^{১৩}

নারীকেন্দ্রিক আন্দোলন :

উনিশ শতকে বঙ্গদেশে ইংরেজ আগমনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে নারীর ‘শিক্ষা’, ‘স্বাভ্যবোধ’, এবং ‘অধিকার’ প্রতিষ্ঠার জন্য নারীকল্যাণমুখী সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এই আন্দোলনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন রাজারামমোহন রায়, ডিক্কাওয়াটার, বেথুন, দ্বারকানাথ, রাখাকান্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সমাজ সংস্কারক। তাঁরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন নারীর উন্নতি ছাড়া সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশে নারীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। যেমন—

- (১) সতীদাহ প্রথা রোধ।
- (২) স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন।
- (৩) বিধবাবিবাহ প্রচলন।
- (৪) বহুবিবাহের বিলোপ।
- (৫) পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।
- (৬) পণপ্রথা বিলোপ ইত্যাদি

রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। রাজা রামমোহন রায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরির সুবাদে ঢাকা, জালালপুর, যশোহর, রংপুর প্রভৃতি জায়গায় ১৮০০ সাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সে সময় তাঁর বড়ভাই জগমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তখন তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি কাজে রত। তিনি লক্ষ্য করেন জগমোহন রায়ের স্ত্রী অর্থাৎ তার বড় বৌদিকে স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত দাহ করা হয়। এই নির্ভুর ঘটনাটি রামমোহনের হৃদয়ে দারুণভাবে আঘাত করে। ১৮১৫ সালে যখন রামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে আসেন তখন ব্রিটিশ সরকারের কাছে

আবেদন জানান যাতে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হয়। এদিকে ব্রিটিশ সরকারও বহুদিন থেকে সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য চিন্তাভাবনা করছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক রীতির বিরুদ্ধতার আশংকায় তাঁরা নীরব ছিলেন। রামমোহন রায় যখনই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তখন ব্রিটিশ সরকারও তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। তারা বুঝতে পেরেছিলেন রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা গ্রহণযোগ্য। তাই ১৮৩২ সালে ১২ জুলাই সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য আইন প্রণয়ন হয়। কৌলীন্য প্রথা, পণপ্রথা, কন্যা বিক্রি, জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য ‘আত্মীয়সভা’ স্থাপন করেছিলেন রামমোহন। এছাড়া পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের বিষয়ে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যও আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। এসব আন্দোলনের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল—

“এই সংগ্রাম কেবল সংস্কারক ও সংস্কার বিরোধীগণের মধ্যে নয়, ইহা স্বাধীনতা ও নির্যাতনের, সুবিচার ও অবিচারের, ন্যায় ও অন্যায়ের সংঘর্ষের ভিতর দিয়া সর্বত্র মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।”^{১৪}

১৮১৮ সালের আগস্ট মাসে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ওপর চলে আসা অন্যায় অবিচার দূর করা এবং নিজ অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনেও আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৪৬ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষার ওপর সর্বাধিক জোর দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেন—

“বিবেককে যাহা অধিক সামর্থ্যসম্পন্ন, তাহাদিগরে

বিশ্বাসকে অধিক দৃঢ় এবং নির্মল করিতে পারে,
তাহাই নারীজাতির বিশেষ আলোচনীয়।”^{১৫}

বোঝা যায়, সামাজিক নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করে নারী অগ্রগতিতে ব্রাহ্মরাও সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছিলেন।

সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়মনীতির আড়ালে নারীদের ওপর হওয়া নানা অত্যাচারের প্রতিকারে রাজা রামমোহনের সঙ্গে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীও অংশগ্রহণ করেন। রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় নারীরা যেভাবে বাঁচার অধিকার পেয়েছিল ঠিক তেমনি বঙ্গদেশের ভূমিতে নারীদের অশিক্ষার অভিশাপ মোচনে, বিধবাবিবাহ প্রচলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দানও চিরস্মরণীয়। তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচলিত হওয়ার জন্য উদ্যোগী হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো অন্যান্য মনীষীরাও সামাজিক নিপীড়ন থেকে নারীদের মুক্ত করার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রামগোপাল ঘোষ যিনি ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন, তিনি ‘বেঙ্গল স্পেক্টেটর’ পত্রিকায় ১৮৪২ সালের জুলাইতে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে প্রবন্ধ বের করেন। সে সময় সমাজের উন্নতির কথা মাথায় রেখে এগিয়ে আসেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য ব্যক্তির। তাঁরা প্রত্যেকেই বিধবাবিবাহ উদ্যোগী হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাস হয়ে স্বাক্ষরিত হয় গর্ভণর জেনারেলের মাধ্যমে। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ৭ ডিসেম্বর কালামতী নামে একটি বিধবার বিয়ে হয় মুর্শিদাবাদের পণ্ডিত সংস্কৃত কলেজের ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সংগে। ১৮৬৪ সালে গুরুচরণ মহলানবীশ নামে প্রথম ব্রাহ্ম যিনি একজন বিধবাকে বিয়ে করে তাকে সামাজিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা করেন। এছাড়া তিনি নিজের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিয়েছিলেন কিছু বিধবা ও হিন্দু কুমারীদের। ফলে তাঁকে অনেক ভয়ংকর

পরিস্থিতির সম্মুখীনও হতে হয়। দ্বারকানাথ গঙ্গুলীও নারীজাতির উন্নতিকল্পে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি ‘অবলাবান্ধব’ বলে পরিচিত। একবার বিষ খাইয়ে ৩২টি কুলীন মেয়েকে মারার চেষ্টা করা হয়। তখন তিনিই সেই মেয়েদের বাঁচানোর জন্য গ্রামের ছেলেদের নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমাজের অন্যান্য স্বনামধন্য প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ শেষপর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে নারীদের নানাধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল শিক্ষা। তাই সে সময় বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন হেতু জোরালো আন্দোলন শুরু হয়।

নারীশিক্ষা :

ভারতবর্ষের মাটিতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন খ্রিস্টান মিশনারীরা। উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রায় ৪০জন যুবতীদের নিয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮১১ সালে। ১৮১৮ সালে রবার্ট মে নামে এক পাদ্রি বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরপর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে কলকাতার ব্যাপটিস্ট (১৮১৯) এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটি (১৮২৩) বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৮১৯ সালে কলকাতায় স্থানীয় ব্যাপটিস্ট মিশনারি স্ত্রীদের প্রচেষ্টায় ‘দি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাণপুরুষ ছিলেন হেয়ার সাহেব। নারীশিক্ষার প্রচলন ও বিস্তার ঘটানো এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরীক্ষা দিয়েছিলেন ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের সঙ্গে। গৌরমোহন বিদ্যালংকার ও রাখাকান্ত দেব বাঙালী স্ত্রীদের শিক্ষার প্রচলনের ক্ষেত্রে এই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য নানা ধরনের কাজ করতে শুরু করেন। স্ত্রীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে গৌরমোহন বিদ্যালংকার

“স্ট্রীশিক্ষা বিধায়ক” নামে একটি বইও লেখেন। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির দেখাশোনায় ২০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮১৯ সালে। কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলিতে সমাজের নিম্নবর্ণের হিন্দু মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণ করতে আসত। ভদ্রঘরের মেয়েরা এসব স্কুলগুলিতে ধর্মান্তরিত করা হবে এই ভয়ে শিক্ষার্জন করতে আসতেন না। এছাড়া তাঁদের অভিভাবকরা হয়তো সদরের রাস্তা দিয়ে বিদ্যালয়ে পাঠানোর বিষয়কে সুনজরে দেখতেন না। তাই এসব বিদ্যালয় স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রি উইলিয়াম ওয়ার্ড ১৮২০ সালে বিলেত গেলেন। সেখানে ভারতবর্ষের স্ত্রীদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথার নামে হওয়া নানা অত্যাচারের কথা বিলেতনিবাসী স্ত্রীদের কাছে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং সেই সঙ্গে নারীর অশিক্ষা কুশিক্ষা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

ভারতবর্ষে নারীদের শিক্ষিত করার অভিপ্রায়ে সে সময় বিলেত নিবাসী স্ত্রীরা ভারতবর্ষে এসে নারীদের উন্নয়নের জন্য নানা কর্মসূচী তৈরি করেন। প্রথম ভারতবর্ষে মেরী কুক নামে এক মহিলা আসেন। মেরী কুক তার প্রচেষ্টায় কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মেয়েরা সে সকল স্কুলে পড়তে আসত না। কারণ সমাজের অভিজাত ব্যক্তিবর্গের ধারণা ছিল তাঁদের মেয়েরা এসব স্কুলে গেলে ধর্মান্তরিত হবে। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন ও নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে মেরী কুকের পর আসেন মেরী উইলসন।

১৮২৪ সালে আরও ২৪টি স্কুল শুরু হয়। সে সময় ‘লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন’ স্থাপিত করা হয়। মিশনারীদের স্কুলগুলি ছাড়াও দেশীয় পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে আরও কিছু স্কুল খোলার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু এ সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মিশনারীরাই। তাদের প্রচেষ্টাতেই ভারতবর্ষের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার উন্মেষ ঘটে।

প্যারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র বারাসাতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন ১৮৪৭ সালে। নবীনকৃষ্ণের তনয়া এই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন। এ কারণে প্যারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রকে একঘরে করা হয়েছিল। সমাজের কিছু ব্যক্তিবর্গ স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন আর সমাজের কিছু রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ, যেমন— কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তির স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন। নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে ১৮৫০ সালে ঈশ্বরগুপ্ত কবিতা লেখেন—

“যত সব ছুঁড়িগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
এবার ‘এ বি’ শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে।
সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে, পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।

...

এরা আপন হতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে
বুঝি ‘হুট’ বলে ‘বুট’ পায়ে দিয়ে, চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।”^{১৬}

প্যারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রের বিদ্যালয়টি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন বা বেথুনকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বেথুন ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৮৪৯ সালের ৭ মে বালিকা বিদ্যালয় শুরু করেন। বেথুন লক্ষ্য করলেন ইংরেজ মিশনারীদের প্রচেষ্টায় যে সব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় সে সব স্কুলের মূলত লক্ষ্য ছিল খ্রিষ্টধর্ম প্রচার, তাই সমাজের সম্ভ্রান্ত হিন্দুবংশের মেয়েরা সেসব স্কুলে শিক্ষার্জন করতে আসত না। বেথুন এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের অভিপ্রায়ে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টির প্রথমে নাম ছিল ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল পরে হিন্দু ফিমেল স্কুল, নেটিভ ফিমেল স্কুল প্রভৃতি বিভিন্ন নাম হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই বিদ্যালয়টি বীটন বালিকা বিদ্যালয় বা বেথুন বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিতি লাভ করে। এই বিদ্যালয়টি সরকারের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য পেত বিশেষ করে

আর্থিক ক্ষেত্রে। বেথুনের এই বিদ্যালয়টি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। সে সময় পর্দাপ্রথা ও অবরোধ হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের পথে প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী, সমাজের প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ, ব্রাহ্মসমাজ, প্রত্যেকেই নারীশিক্ষার প্রচলন ও অবরোধ প্রথার প্রতিরোধে একের পর এক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

১৮৫৭-৫৮ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার কাজে অনেক অর্থের প্রয়োজন ছিল তাই নারীশিক্ষা ভাঙার খোলা হয়। সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির সাধ্যানুযায়ী চাঁদা দিতেন। ১৮৬০-৭০ এর পটভূমিতে দেখা যায় সমাজের বিভিন্ন প্রগতিশীল ব্যক্তির যেমন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, রাখালচন্দ্র রায়, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নারীদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা এবং নারীদের শিক্ষার্জনের চেষ্টায় আন্দোলন করছিলেন। আর এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পরীক্ষা দেবার সুযোগ হয় ১৮৮৭ সালে। এছাড়া ১৮৬৬ সালে নারীশিক্ষা প্রচলনের জন্য বিলাতনিবাসী মেরী কার্পেন্টার ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখেছিলেন। রাজা রামমোহনের বিলাত সফরকালে তিনি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং তিনি রামমোহন রায় থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। নারীশিক্ষা প্রচলন ও প্রসারের ক্ষেত্রে আরো একজন মহিলা অ্যান্ট আক্রয়েডের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। ১৮৭২ সাল থেকে রংপুর, ফরিদপুর, বীরভূম, বহরমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নারীশিক্ষা প্রচলনহেতু অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রিঃ ‘মহাকালী পাঠশালা’ নামে কলকাতায় একটি স্কুল খুলেন গঙ্গাবাই নামে এক মারাঠি ব্রাহ্মণ মহিলা।

এরপর ১৮৯৩ খ্রিঃ ‘মহাকালী পাঠশালা’ স্থাপন করেন মহারাণী স্বর্ণময়ী

আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত তাঁর ভবনে। স্কুলটিতে প্রথমে ছাত্রী সংখ্যা ৩০ পরে বেড়ে ৪০০তে গিয়ে পৌঁছয়। ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সুকিয়া স্ট্রিটে স্কুলের ভবন স্থানান্তরিত হয়। মহারাণী তপস্বিনীর আমন্ত্রণে স্কুল পরিদর্শন করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

“The movement is in the right direction” ^{১৭}

১৮৯৮ সালে ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর সহকর্মী হিসেবে কিছুদিন পর আসেন ক্রিস্টিনা। ১৮৯৮ সালে ১৩ নভেম্বর নিবেদিতা স্কুল স্থাপন করেন। নিবেদিতা এই স্কুলের নামকরণ করেন ‘The Ramakrishna School for Girls’। পরে ১৯১৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে এর নাম হয় ‘The Ramakrishna Mission Sister Nivedita Girl's School’। ১৯৬৩ সালের ৯ আগস্ট থেকে এ স্কুলের নাম দেওয়া হয় **Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girl's School**।

১৮৯৭ সাল স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়। কেননা এই সময় **co-education** বা সহশিক্ষা চালু হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে। অমিয়া রায় ও চারুলতা রায় এই দুজন ছাত্রী প্রথম ভর্তি হন এফ.এ. ক্লাসের প্রথম বর্ষে। তাদেরকে নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করা হয়। ব্যাপারটি গড়িয়ে যায় লেফটেনেন্ট গভর্নর পর্যন্ত। ১৯১০ খ্রিঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পরিবর্তে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শুরু করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ শতকের সূচনালগ্নে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেন। এগুলো হলো—

(ক) “স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার জন্য আর কোন-কোন বিষয়ে সুব্যবস্থা প্রয়োজন।”

(খ) “উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর কী ধরনের সমস্যা সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং তার থেকে উত্তরণের উপায় কী।”

১৯৩২-৩৩ সালে স্ত্রীশিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করে। সে সময় দেখা যায় মহিলা কলেজের সংখ্যা বেড়ে চার থেকে ছয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রীশিক্ষার সে সময় যে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে—

১৯৩৮-এ বেথুন কলেজের পাশের হার—^{১৮}

এম.এ. — ৩৭ জন

বি.এ. — ২৪৭ জন

আই.এ. — ৫৫৯ জন

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এর প্রভাব শিক্ষাব্যবস্থাতেও পড়ে। ১৯৫০ সালে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হলেও কোন কিছুই কার্যকরী হয়নি। ১৯৯০ সালে সাক্ষরতা প্রকল্প চালু হয়। সেই সাক্ষরতা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা।

“ফলে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৮ সালের সরকারি হিসেব অনুযায়ী সাক্ষর পুরুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০.৮০ লক্ষ এবং মহিলা ৪৪.৪৮ লক্ষ।”^{১৯}

এভাবে ধীরে-ধীরে স্ত্রীশিক্ষা সম্প্রসারণ ঘটেছিল। দেখা যায়

“নারীশিক্ষার হার ১৯৯১ সালে যেখানে ছিল ৩৯.৩ শতাংশ, সেখানে ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে

নারীশিক্ষা ও মুসলমান সমাজ :

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মধ্যদিয়ে মুসলমান রাজত্বের সমাপ্তি এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষে সূচনা হয় ইংরেজ শাসনের। ইংরেজ আগমনে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রচলন হলেও সেসব দিকে মুসলমান সমাজের ব্যক্তিবর্গ দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। ১৮৭৩ সালে হিন্দু কলেজে যখন মুসলমান ছাত্রদের অনুপ্রবেশ ঘটে তখন থেকেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মাতে দেখা যায় মুসলমানদের। তবে শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রেই। মেয়েদের নিয়ে সমাজ তখনও উদাসীন ছিল। হয়তো মেয়েদেরও সে শিক্ষার প্রয়োজন আছে অনুধাবন করতে পারেন নি তাঁরা।

উল্লেখ্য যে, ১৮২২ সালে শ্যামবাজার অঞ্চলের একজন মুসলমান মহিলা মুসলমান মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বাড়ি-বাড়ি ঘুরে মেয়েদের সংগ্রহ করেছিলেন। বিনয় ঘোষ বলেছেন—

“কলকাতা শহরের মুসলমান পুরুষরাই যখন ইংরেজদের প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখান নি, তখন একজন খ্রীস্টান মহিলা প্রচারিত খ্রীশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া, একজন মুসলমান মহিলার পক্ষে নিশ্চয় একটি বিস্ময়কর ঘটনা। শুধু তাই নয়, একজন মুসলমান মহিলা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, মুসলমান নারীর শিক্ষার উদ্দেশ্যে। এটা আরও বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

এছাড়া মির্জাপুর, এন্টালি, জানবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানরাও দেখা যায়, মিস কুকের (মিসেস উইলসনের) স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এইসব অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিলেন।”^{২১}

কুমিল্লার নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় ‘ফয়জুন্নেসা গার্লস স্কুল’ স্থাপিত হয় ১৮৭৩ সালে। ১৮৮১-৮২ খ্রিঃ মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায়—

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্রী সংখ্যা	মুসলমান ছাত্রী সংখ্যা	হার
উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	—	—
মাধ্যমিক ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৬	১.১
দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১
দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭,৪৫২	১,৫৭০	৮.৯
শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪১	—	—

১৮৯৭ খ্রিঃ মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম শামসি ফেরদৌস প্রথম ‘মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা’ নামে মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় নির্মাণ করেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের সূচনালগ্নে শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজে সচেতনতা দেখা দেয়। কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয়ের আরও প্রয়োজন বুঝতে পেরে ১৯০৯ খ্রিঃ বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতা খুজিস্তা আখতার বানু স্থাপন করেন ‘সোহরাওয়ার্দীর বালিকা বিদ্যালয়’। ১৯০১

খ্রি: আদমশুমারিতে দেখা যায় ইংরেজি জানেন ৪০০ জন মুসলমান স্ত্রীলোকা
এর উল্লেখ আছে সাময়িক পত্র ‘মিহির ও সুধাকর’এ—

“আমরা কখনও স্বপ্নে ভাবি নাই ১৯০১ সালের
আদমশুমারী আমাদের নিকট ৪০০ (চারিশত)
মুসলমান স্ত্রীলোকের ইংরেজি শিক্ষার কথা প্রচার
করিবে। একথা প্রচারিত হওয়ার পর আমাদের কর্তব্য
কি? যদি অন্তঃপুরে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন সম্ভব,
তবে স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে
আপত্তি কি? যে সব স্কুলে মুসলমান বালিকার
প্রবেশাধিকার আছে, তথায় তাহাদের ইংরাজী শিক্ষা
প্রদানে ক্ষতি কি? কলিকাতার বেথুন স্কুলে মুসলমান
বালিকার প্রবেশাধিকার নাই। বেথুন কলেজ ছাড়া
অন্যান্য স্কুলে তাহারা পড়িতে পারে। বিশেষ
আমাদের বালিকা মাদ্রাসাগুলিতে ইংরাজী শিক্ষার
ব্যবস্থা করিলে সর্বোৎকৃষ্ট হয়।”^{২২}

১৯১১ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলিম নারীদের কাছে
শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল’ স্কুল স্থাপন করেন। ১৯১৬
থেকে সরকারি সাহায্য পেতে শুরু করে অনেকগুলি মুসলিম মেয়েদের স্কুল।
সরকার মুসলিম নারীদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম আরম্ভ
করার পরিকল্পনাও সে সময় নেন।

নারীমুক্তি ভাবনা :

উনিশ শতকে সমাজসংস্কারকদের একের পর এক নারীমুক্তি আন্দোলনের
ফলস্বরূপ পশ্চাদপদ বাঙালি নারী অন্তঃপুরের অবরোধ ছিন্ন করে শিক্ষার্জন

করে, বর্হিজগতে বেরোনোর সুযোগ পায়।

বিশ শতকের সূচনাতে দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও যোগদান করে। এই আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখীবন্ধন ইত্যাদি কর্মসূচি পালিত হয়। ১৯১১ সালে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রচেষ্টায় এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও অহিংসা আন্দোলনে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও যাতে সমানভাবে যোগদান করে তাই গান্ধীজী নারীসমাজকে আহ্বান জানান। গান্ধীজী বুঝতে পেরেছিলেন, “নারীসমাজের অংশগ্রহণ ছাড়া জাতীয়মুক্তি সম্ভব নয়।”

পুরুষের মতো নারীরাও যাতে সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার পান, তাই জাতীয় কংগ্রেস সূচনা থেকেই শুধু পুরুষদের নয়, নারীদেরও সদস্যরূপে গ্রহণ করেছেন। এই সদস্যদের মধ্যে ছিলেন— স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী দেবী, বিদূষী রমাবাঈ প্রমুখ। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে দ্বারকানাথের প্রস্তাবটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্বীকৃতি দিলেন। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় নারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অ্যানি বেসান্ত-এর বক্তব্য ছিল—

“One of the delegates Mrs. Kadambini Ganguly was called on to move the vote of the thanks to the chairman the first woman who spoke from the congress platform, a symbol that Indian's freedom would up lift. India's woman hood.” ২৩

সমানাধিকার ও ভোটাধিকারের জন্য নারীদের এই আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসও জোড়ালোভাবে সমর্থন জানান। নারীরা রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে নিজস্ব অধিকার প্রাপ্তির জন্য একই সঙ্গে আন্দোলন শুরু করলেন। এসব আন্দোলনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন অ্যানি বেসান্ত, মাদাম কারা, সরোজিনী নাইডু ও মার্গারেট কাজনিস। নারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম আইন সভায় মাদ্রাজের মেয়েদের ভোটের অধিকার প্রাপ্ত হয়। ১৯২৫ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নারীদের ভোটাধিকার মেনে নেওয়া হয়। নারীরা পুরুষের মত ভোটের অধিকার পান।

সশস্ত্রবিপ্লবী আন্দোলনেও নারীদের ছিল অংশগ্রহণ। প্রথমদিকে পুরুষের মননে দ্বিধা ছিল নারীরা এই সংগ্রামে যথার্থভাবে তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন কিনা? তাদের এই দ্বিধার জন্য নারীদের বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। দেখা যায় ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরবর্তী সময় থেকে মেয়েরা সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। প্রীতিলতা নামে একজন মহিলা ইউরোপীয়ান ক্লাব অভিযানের পর তাঁর সব সাথীদের বিপদহীন স্থানে পাঠিয়ে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে প্রমাণিত করেছিলেন দেশের জন্য মেয়েরাও নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে। পরবর্তী সময়ে নারীরা স্বাধীনতা আন্দোলনেও এগিয়ে এলেন। প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকে নারীরা শুধু স্বাধীনতাই পেলেন না নারীর অন্তর্নিহিত চেতনারও মুক্তি ঘটে। নারীরা পুরুষের সহযাত্রী, সহমর্মী হয়ে এক উভলিঙ্গ সমাজ গঠনের দাবি করেন—

“সমাজ পুরুষ ছিল, এবার উভলিঙ্গ হোক”

নারীর বাচন নারীর লেখন :

নারীমুক্তির সূচনাপর্বে নারীর বয়ানকে জনসমক্ষে ছড়িয়ে দিতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে সংবাদপত্র। ১৮৩১ সালে ‘অমুকীদেবী’ ছদ্মনামে সমাজনীতির প্রতিকার চেয়ে যে চিঠিটি ‘সম্বাদ কৌমুদী’তে প্রকাশিত হয় এইটিই নারীর লেখা প্রথম পত্র। প্রথমাবস্থায় নারীরা বিভিন্ন ছদ্মনামের আড়ালে সংবাদপত্রে লিখতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত লেখার বিষয়। যেমন— শিল্পকলা, পড়াশুনার গুরুত্ব, স্বামী-স্ত্রীর সদ্ভাব প্রভৃতি। কিন্তু পরবর্তীকালে নারী তাঁর নিজের নির্বাচিত বিষয়ে নিজের মত করে লিখতে শুরু করেন। দীর্ঘকালব্যাপী পুরুষতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত নিয়মনীতির যুগকাঠে বলি হওয়া মেয়েদের ক্ষোভ, বেদনা, যন্ত্রণা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের লেখনী। যদিও প্রথমদিকে নারীর লেখনীতে তেমন একটা প্রতিবাদী স্বর শোনা যায় না। ১৮৫০ সালে ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকা ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ কয়েক পংক্তি নারীর লেখা কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে ১৮৫০ সালের প্রাক্কালে মহিলাদের রচিত কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তখন (২১ এপ্রিল ১৮৪৯) ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ এই বিষয়ে ঈশ্বরগুপ্ত লিখেন—

“এত মহানগরীর কোন সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়েস্থের
নবমবর্ষ বয়স্কা এক সুরূপসী অবিবাহিতা কন্যা
দৈবশক্তির গদ্যপদ্য রচনা বিষয়ে অতি অদ্ভুত ক্ষমতা
প্রাপ্ত হইয়াছে, ওই বালিকা রীতিপূর্বক শিক্ষা করে
নাই, কারো নিকট উপদেশ পায় নাই, কেবল
আপনার যত্নের দ্বারাই শিক্ষিতা হইতেছে।”

১৮৫৬ সালে রচিত কৃষ্ণকামিনী দাসীর ‘চিত্রবিলাসিনী’ কাব্যটি বাঙালি মহিলার রচিত প্রথম পুস্তক। বঙ্গললনা কৈলাসবাসিনীদেবী মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে প্রথম দাবি তোলেন। তিনি ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনবস্থা’ এবং ‘হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভাস’ নামে দুটি পুস্তক লিখেন। পুস্তক দুটিতে সমাজের অহেতুক

অভিযোগ আর অযৌক্তিক আপত্তি খণ্ডন করে তিনি লিখেছেন—

“হায়! বিদ্যা শিখিলে বিধবা হইবে? বিদ্যার কি
পতিঘাতিনী শক্তি আছে যে তদ্বারা নারীগণ
পতিরত্নে বঞ্চিত হইবে?”^{২৪}

পুরুষদের নারীর প্রতি করা সমস্ত অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী
কণ্ঠস্বর শোনা যায় নারীদের লেখনীর মাধ্যমে। ১৮৩৫ সালে ‘সমাচার দর্পণে’
টুঁচুড়ায় মহিলাদের লেখা দুটি চিঠির বয়ানে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়।
হয়ত এটাই প্রথম নারীবাদী প্রতিবাদ। শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ পায়
নারীর লেখনীতে। ‘নারীর প্রতি অবিচার’ নামে এই প্রবন্ধে ক্ষুদ্র তমাললতা
লিখেছিলেন—

“আজকাল পুরুষরা চান শিক্ষিতা স্ত্রী, কিন্তু সে
কতটুকু শিক্ষিতা? যতটুকু শিক্ষিতা হলে তাঁদের স্বার্থে
হাত না পড়ে, ব্যস্ এই পর্যন্ত এর বেশী নয়।”

‘নারীর কথা’ প্রবন্ধে সোনামাখা দেবী লিখেছেন—

“আজো এ দেশের স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী বেশীর ভাগ
লোকেরই মত— ঘর গৃহস্থালীর দৈনিক খরচের
হিসাব-পত্র রাখবার ক্ষমতা লাভ করা ও চলনসই
চিঠিপত্রখানা লিখতে পারাই মেয়েদের বিদ্যালান্তের
পক্ষে যথেষ্ট। এদলের মতো অল্পবিদ্যা অপরের
পক্ষে ভয়ঙ্করী হলেও অবরোধবাসিনীদের বেলায়
তাই-ই হচ্ছে শুভঙ্করী।”

কৃষ্ণভাবিনী দেবীর ‘স্ত্রীলোক ও পুরুষ’, ‘শিক্ষিতা নারী’ ইত্যাদি রচনার

মধ্যদিয়ে নারীবাদ সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দিনের পর দিন কাটিয়ে আসা অন্তঃপুরের অনেক না বলা কথা, তাঁদের দুঃখ-যন্ত্রণা শোনা যেতে থাকে নারীর লেখা আত্মজীবনীতে।

রক্ষণশীল সমাজের বুকো দাঁড়িয়ে রোকেয়াও লেখনীর মাধ্যমে প্রচলিত সমাজভাবনার প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি পুত্র ও কন্যার সমকক্ষতার দাবি তুলেছিলেন—

“একটি পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার
সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই।”^{২৫}

রোকেয়ার বিদ্রোহ পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আশাপূর্ণা দেবীর কলমেও ওঠে আসে মেয়েলি উপভাষায় মেয়েলি বাগভঙ্গিমায় অন্তঃপুরের রীতিনীতির বন্ধনে বন্দি নারীর জীবনকাহিনী। কখনও সেই মেয়েদের মধ্যে দেখা যেতে থাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রবণতা। আশাপূর্ণা দেবীর সমসাময়িক ছিলেন আশালতা সিংহ। আশালতা সিংহ তাঁর উদ্ভরকালীন ও সমকালীনদের থেকে ছিলেন স্বতন্ত্র। সুতীক্ষ্ণদৃষ্টির অধিকারিণী আশালতার কলমে উঠে এসেছে নারীর জীবনকাহিনী।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান কতটা নগণ্য তা আশালতা অনুভব করতে পেরেছেন বলে তাঁর বেশীর ভাগ গল্পেই উঠে এসেছে নারীজীবনের বিচিত্র সংকট ও যন্ত্রণার কথা। সমকালীন রক্ষণশীল সমাজে নারীর জীবন সীমাবদ্ধ ছিল অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে। তবে আশালতার সৃষ্ট নারীরা অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। তাঁরা শিক্ষিত, গান-বাজনায় পারদর্শী, আধুনিক। সময় ও সমাজ থেকে অনেকটাই প্রাগ্রসর।

সমাজসচেতন আশালতার গল্পের বিষয় হিসেবে তৎকালীন সমাজ ও তৎসম্পর্কিত নানা সমস্যা, যেমন— বেকারসমস্যা, পণপ্রথা, জাত-পাত,

মূল্যবোধহীনতার মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো বার-বার উঠে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে মানবজীবনে যে শোচনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে চারিদিকে খাদ্যসংকট, বস্ত্র সংকট, বেকারত্ব, দারিদ্র্য দেখা দিয়েছিল এইসব কিছুই ছবিও ফুটে উঠেছে তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পে। এছাড়াও কোনো-কোনো গল্পে লেখিকার ‘স্বকীয় মানসিকতা’, ও ‘ব্যক্তিগত জীবনের’ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে লেখিকার কন্যা নীলিমা সরকার জানান—

“তিনি নিজেকে কল্পনার রঙ-এ নানাভাবে তাঁর রচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে ভালোবাসতেন। তাঁর ছোটো ছোটো গল্পের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।”^{২৬}

আশালতার গল্পগুলি ইতিমধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘স্কুল অব উইমেন্স স্টাডিজ’ এর উদ্যোগে ‘আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-১ (২০০৬) এবং ‘আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২ (২০০৭) নামে প্রকাশিত হয়েছে। ‘অভিমান’ ও ‘অন্তর্যামী’ নামের দু’টি গল্পগ্রন্থ প্রথম গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত। ‘অভিমান’ গল্পগ্রন্থে মোট ৭টি এবং ‘অন্তর্যামী’ গল্পগ্রন্থে ৫টি গল্প স্থান পেয়েছে। এছাড়াও সাতাশটি অগ্রস্থিত গল্প রয়েছে প্রথম গল্প সংকলনে। আশালতার দ্বিতীয় গল্পসংকলনে ‘লগন বয়ে যায়’ গল্পগ্রন্থের ১৯টি এবং ‘মধুচন্দ্রিকা’র ২০টি গল্প স্থান পেয়েছে। এছাড়াও অগ্রস্থিত গল্পের সংখ্যা রয়েছে সাতাশটি। বিহার বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আশালতা সিংহ রচনাবলীতে পাঁচটি গল্প থাকা ‘অন্তর্যামী’ গল্পগ্রন্থটি। এছাড়াও আরও তিনটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় আশালতার জীবিতকালে।

স্বল্প পরিসরে গঠিত ছোটগল্পে মানবজীবনের বৈচিত্র্যময় নানা অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। ছোটগল্পের রূপাবয়বের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা যেতে পারে—

“সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
তোমার মধ্যে আমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।”

—রবীন্দ্রনাথ

পাশ্চাত্যের ছোটগল্পকারদের নির্মিত গল্পের অনুসরণে বাংলা ছোটগল্পের জন্ম। ইতালির গিওভানি বোকাচো (১৩২৩-৭৫ খ্রিঃ) রচিত ‘দেকামেরন’, ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া র্যাবলা রচিত ‘গারগঁতুয়া ও পোঁতাগ্রুয়েল, ইংল্যান্ডের জিও ফ্রে সোর (১৩৪০-১৪০০ খ্রীঃ) রচিত ‘ক্যান্টারবেরি টেলস’ এর মাধ্যমে ছোটগল্পের পটভূমি তৈরি হয়েছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যে। অন্যদিকে সে সময় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ ছিল অনুবাদসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও মানবিক প্রেম সমৃদ্ধ রোমাণ্টিক আখ্যায়িকা কাব্যে।

বাংলা ছোটগল্পের প্রস্তুতিপর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) নিয়ে আবির্ভূত হন। বঙ্কিমের এই আবির্ভাব এবং অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তিতে যখন সমসাময়িক কাল আলোড়িত তখন তাঁরই সম্পাদিত পত্রিকা ‘বঙ্গদর্শনে’ ছোটভাই শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘মধুমতী’ নামে একটি গল্প লেখেন। ‘মধুমতী’ গল্পটিকে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ছোটগল্প রূপে চিহ্নিত করা হয়।

‘ছোটগল্প’ সৃজনে মূল প্রেরণা দান করে সে সময়ে প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকা। পত্রিকাগুলিতে লেখার জন্য সে সময় বিভিন্ন লেখকরা ছোটগল্প রচনায় উৎসাহী হন। বাংলা ছোটগল্পধারায় রবীন্দ্রযুগের পূর্বে স্বর্ণকুমারীদেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ত্রৈলোক্যনাথকে গল্পকাররূপে পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়—

“উপন্যাসের মত, ছোটগল্প জিনিষটাকে পশ্চিম হইতে বঙ্গসাহিত্যে আমদানি করিয়াছি। ছোটগল্পের জন্ম সুদূর পশ্চিমে আমেরিকায়। মার্কিনেরা বড় ব্যস্ত জাতি— তাহাদের নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই— তাই বোধ হয় সে দেশে ছোটগল্পের জন্ম হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে ইউরোপ এবং তথা হইতে আনীত হইয়া এখন ইহা মহিয়সী বঙ্গ রাণীর চরণে নুপুর স্বরূপ বিরাজিত, মৃদু মধুরশিঞ্জনেরবে বঙ্গীয় পাঠকের চিত্ত বিনোদন করিতেছে। পূর্বকালে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু তিনটি ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন। সঞ্জীববাবু দু একটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া স্মরণ হইতেছে। সেগুলি আকারে ছোটমাত্র নচেৎ উপন্যাসেরই লক্ষণাক্রান্ত। বর্তমান সময়ে ছোটগল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই তাহা বঙ্গ সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন।”^{২৭}

১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প ‘ভিখারিণী’।

উনিশ শতকে মানুষের চিন্তা চেতনায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। পুরোনো মূল্যবোধের পতন, অ বিশ্বাস, অস্তিত্বের সংকট— এরূপ সংশয়াকুল পরিবেশে ছোটগল্পের জন্ম। আশালতার ছোটগল্প বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক হলেও মূলতঃ গল্পের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে নারী। পুরুষতন্ত্রের কঠোর নিয়মনীতির বন্ধনে বন্দী অসহায় নারীর জীবন যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই মানবদরদী আশালতার গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে নারীজীবন। তাই আশালতা

বিরোধিতা করেছেন “পিতৃতন্ত্র নামে এক দর্শন ও তার নিজস্ব আচরণবিধির”। তবে আশালতা বিশ্বাস করেননি পুরুষশাসিত সমাজে সকল পুরুষই নারীর শত্রু। আশালতা জানতেন নারীরা প্রকৃতিগত ভাবেই মাতৃত্বলাভ করার সৌভাগ্য পেয়ে থাকেন। যা নারীর

“একটি প্রধান বৃত্তি, ধর্ম ও স্বরূপ, কিন্তু তাহাই
তাঁহার একমাত্র বৃত্তি, ধর্ম ও স্বরূপ নহে। পুরুষ
যেমন আত্মা, নারীও তেমন আত্মা। পুরুষ যেমন
মানুষ, নারীও তেমনি মানুষ।”^{২৮}

তাই নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা নানাভাবে তাঁর গল্পের মধ্যদিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন তিনি। নারী-শিক্ষাই নারীকে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি দিতে পারে বলেই আশালতা নারী-শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রে।

আশালতা চেয়েছিলেন, ‘লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ’। যেখানে নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা থাকবে না। নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আশালতা পুরুষতন্ত্রের সেই নির্ণীত নিয়মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন যেখানে নারী ‘মেয়ে’ বলে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। আশালতার গল্পে এই বিষয় আমাদের বার-বার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আশালতার এই লিখনবিশ্ব তৎকালীন সমাজের বুকে এক দুঃসাহসিক কর্মের পরিচায়ক।

উল্লেখসূত্র :

১. মুরারিমোহন সেনশাস্ত্রী অনুদিত 'মনুসংহিতা', পৃঃ ৩৭৫
২. শতপথ ব্রাহ্মণ (২/৩/২/৮)
৩. মৈত্রায়ণী সংহিতা (৩/৮/৩, তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬/৫/৮/২)
৪. মৈত্রায়ণী সংহিতা (১/১০/১১)
৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'নারীর মূল্য', অদিত্য প্রকাশালয়, কলকাতা-৯, সপ্তম প্রকাশ— অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃঃ ২০
৬. 'মহীয়সী ভারতীয় নারী', উদ্বোধন, পৃঃ ২৭
৭. দ্র. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'নারীর মূল্য', পৃঃ ২১
৮. মৈত্রায়ণী সংহিতা (৩/৬/৩; ৪/৬/৭; ৪/৭/৪ ; ১০/১০/১১)
৯. সাফিয়া খাতুন বিদ্র, 'নারীর অধিকার ও অন্যান্য', সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, পৃঃ ৮২
১০. রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি, রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, কলকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৭৩-৭৪, পৃঃ ২০৫
১১. **C. Rover, Love Morals and The Feminists, London : Routledge R.K. Paul, 1970, P-149**
১২. রামমোহন রায়, প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, পরিবৎ সংস্করণ, ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, নারীজাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ৩৩-৩৪
১৩. **'The English works of Raja Rammohan Roy' Vol. 2, ed by J.C.**

১৪. নির্মল সেনগুপ্ত, রাজর্ষি রামমোহন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা, পৃ: ৫৮
১৫. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ: ৩৫
১৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'দুর্ভিক্ষ', কবিতাসংগ্রহ, প্রথমখণ্ড, কলকাতা, ১৮৮৫, পৃ: ১২১-১২২
১৭. সুখময় সেনগুপ্ত, 'বঙ্গদেশ ইংরাজী শিক্ষা : বাঙালী শিক্ষাচিন্তা', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃ: ১১৩
১৮. সুপর্ণা গুপ্ত, ইতিহাসে নারীশিক্ষা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০১ঙ্ পৃ: ১৩৪
১৯. দ্র. ঐ, পৃ: ১৪৪
২০. স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে কেন্দ্রের উদ্যোগ ব্যাপক সাফল্য, দৈনিক যুগশত্রু, শিলচর, ২৯ জুন, ২০০৩, পৃ: ৩
২১. বিনয় ঘোষ, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ', পৃ: ১১৩
২২. শামসুন নাহার মাহমুদ, 'রোকেয়া জীবনী', পৃ: ১৫
২৩. দ্র. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, পৃ: ৬৩
২৪. কৈলাসবাসিনীদেবী, 'হিন্দু মহিলাগণের হীনবস্থা', খোঁজ এখন, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ: ৩৪
২৫. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, 'স্ত্রীজাতির অবনতি', মতিচূর, প্রথম খণ্ড, রোকেয়া রচনাবলী, কলকাতা, পৃ: ২৫
২৬. 'আশালতা সিংহ' শিরোনামে নীলিমা সরকারের প্রথম চিঠি, দেশ, ২৯ অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ: ৪
২৭. মনোজ মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা ছোটগল্প উৎস ও স্বরূপ', বামা পুস্তকালয়,

কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ— আগস্ট, ২০০০, পৃ: ৪২

২৮. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : 'মাতৃত্বের কার্যক্ষেত্র' ড. কষ্টিপাথর, বিভাগ,
প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯, পৃঃ ৩৪৭

